আলোর পথে এসো

আসাদ বিন হাফিজ

আলোর পথে এসো

আসাদ বিন হাফিজ

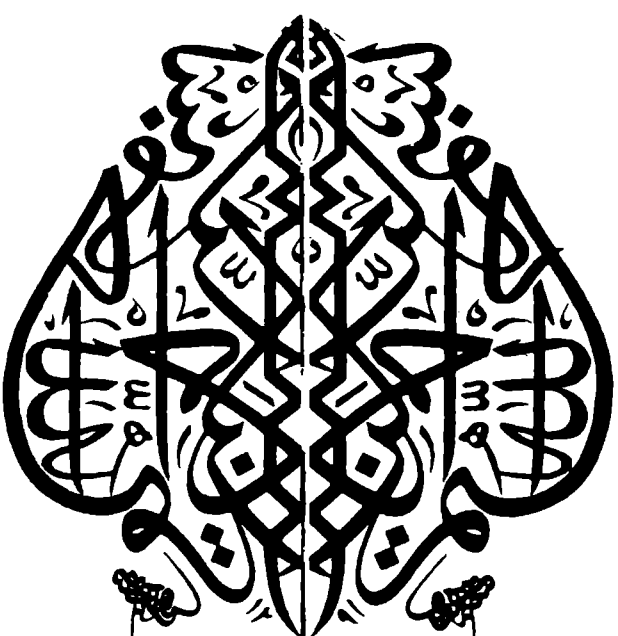

প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮, ৮৩১৯৫৪০, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩১৯৫৪০
E-Mail: asfaqure@bdonlin.com

www.pathagar.com

আলোর পথে এসো ॥ আসাদ বিন হাফিজ
প্রকাশক: নুসাইবা ইয়াসমীন
প্রীতি প্রকাশন, ৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮, ৮৩১৯৫৪০, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩১৯৫৪০
E-Mail: asfaqure@bdonlin.com
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৯৯
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : প্রীতি ডিজাইন সেন্টার
মুদ্রণ : প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস

মূল্য : ২০.০০

Alor Pathy Ashu
Written by : Asad Bin Hafiz
Published by: Nusaiba Yesmin
Preeti Prokashon
435/ka Bara Moghbazar, Dhaka-1217
Phone: 8321758, 8319540 , Fax: 880-2-8319540
E-Mail: asfaqure@bdonlin.com
1st Edition : December 1999
Price: TK. 20.00

ISBN- 984- 581- 154- X

www.pathagar.com

ভূমিকা

সব মানুষই চায় সুখে থাকতে, শান্তিতে থাকতে, দুঃখ কষ্ট থেকে বাঁচতে, জীবনকে সফল করতে। কিন্তু চাইলেই তো আর তা পাওয়া যায়না, কিভাবে তা পেতে হয় তাও জানতে হবে। মানুষের সুন্দর জীবন পাওয়ার পথ বলে দিয়ে গেছেন যুগে যুগে নবী রাসূলগণ। তাদের মাধ্যমেই আমরা জানতে পেরেছি, কে আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং কেন করেছেন? তাঁরা আমাদের জানিয়েছেন, এ বিশাল দুনিয়া মহান আল্লাহর এক মস্ত সংসার। দুনিয়ার সবকিছুই তাঁর। মানুষ মূলতঃ তাঁর গোলাম, কিন্তু তিনি মহানুভব বলেই মানুষকে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধির মর্যাদা দিয়েছেন এই দুনিয়ায়। ফলে, মস্ত এক দায়িত্বের বোঝা চেপেছে মানুষের কাঁধে।

এ দায়িত্ব পালন করে আবার মানুষকে ফিরে যেতে হবে তাঁর কাছে। মরণ মানুষকে নিয়ে যাবে আরেক জগতে। সেখানে মানুষকে হিসাব দিতে হবে এ দুনিয়ার সমস্ত কাজের। দুনিয়ায় সে সঠিকভাবে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করে থাকলে পাবে পুরস্কার আর না করে থাকলে পাবে শাস্তি।

মানুষ যাতে ইহকালে এবং পরকালে সাফল্যের সাথে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে পারে সে জন্য যুগে যুগে নবী রাসূলগণ মানুষের কাছে নিয়ে এসেছেন আল্লাহর বাণী। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ যে বাণী নিয়ে এসেছেন কেয়ামত পর্যন্ত তাই মানুষকে দেবে সঠিক পথের দিশা। শিশু কিশোররা যেন সে সহজ সরল পথের সন্ধান পায় তার জন্যই এ বইতে আলোচনা করা হয়েছে তাদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্বন্ধে।

প্রতিটি শিশু কিশোরকে এ বই এক আলোর জগতের সন্ধান দেবে। আশা করি অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদেরকে সে আলোর জগতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এ বই তুলে দেবেন তাদের হাতে। আমার এ জাতীয় প্রথম বই 'নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন' ব্যাপকভাবে সমাদৃত হওয়ায় এ বই লেখায় আমি অনুপ্রেরণা পেয়েছি। আশা করি এ বইটিও সমাদৃত হবে। আল্লাহ আমাদের সবার ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ ও মঙ্গল দান করুন। আমীন।

আসাদ বিন হাফিজ।

www.pathagar.com

সূ চী প ত্র

এক	◆	তাকাও দু'চোখ মেলে	৫
দুই	◆	সৃষ্টি ও স্রষ্টার কথা	৬
তিন	◆	আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়	৭
চার	◆	মানুষের পরিচয়	৯
পাঁচ	◆	আল্লাহর আইন	১১
ছয়	◆	আজকের দুনিয়া	১৩
সাত	◆	অশান্তির কারণ	১৪
আট	◆	নবী রাসূলদের কথা	১৫
নয়	◆	মহানবীর শিশুকাল	১৭
দশ	◆	মহানবীর কথা	১৯
এগার	◆	কোরআন ও সুন্নাহর কথা	২০
বার	◆	মৃত্যুর পরের জীবন	২২
তের	◆	বেহেশ্‌ত ও দোযখের কথা	২৫
চৌদ্দ	◆	আমাদের করণীয়	২৬
পনর	◆	মহিয়সী মহিলাদের কথা	২৭
ষোল	◆	একতায় বল	২৯
সতের	◆	ছাত্র-ছাত্রী ভাই-বোনদের জন্য সংগঠন	৩০
আঠারো	◆	শেষ কথা	৩২

www.pathagar.com

এক ● তাকাও দু'চোখ মেলে

চোখ দুটো খুলে এদিকে ওদিকে তাকালেই আমরা দেখতে পাই নানান ধরনের, নানান রকমের কত শত প্রাণী। বিচিত্র তাদের চেহারা, বিচিত্র তাদের স্বভাব। দৃষ্টির সামনে খোলা প্রান্তর। উদার প্রকৃতি। খোলা মাঠ। ফসলের ক্ষেত। চারদিকে কত গাছ-গাছালি, বন-বনানী, পাহাড়-নদী। সুনীল সাগরে খেলা করে রূপোলী মাছ। বনের গভীরে হিংস্র জীব-জানোয়ার। দুনিয়া জোড়া কত নদ-নদী, পশু-পাখী, জীবজন্তু, পোকা-মাকড় আরও কত কি?

মাথার ওপর বিশাল আকাশ। আকাশে সূর্য ও চাঁদ-তারার খেলা। গাছে গাছে ফুল, ফল। ঝিরিঝিরি বাতাস। এত যে সৃষ্টি বৈচিত্র এসব কিছুর স্রষ্টা কে? কে বানিয়েছেন এ পৃথিবী? বানিয়েছেন আকাশ-বাতাস? বানিয়েছেন তারকারাজি? চাঁদ, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র– এক কথায়, আমরা দু'চোখে যা কিছু দেখতে পাই আর যা কিছু দেখতে পাই না সব কিছু?

এসব কিছুর স্রষ্টা হচ্ছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনিই বানিয়েছেন পৃথিবী। বানিয়েছেন বিশ্বজাহানের সবকিছু।

এ ব্যাপারে কোরআনে আল্লাহ খুব মজার কথা বলেছেন। আল্লাহপাক বলেছেন– **পৃথিবীতে যত সাগর আছে, তার সব পানি যদি কালি হয়ে যায় এবং পৃথিবীতে যত গাছ আছে তা দিয়ে যদি কলম বানানো যায়, তবুও আল্লাহ পাকের সৃষ্টির রহস্য লিখে শেষ করা যাবে না।**

সত্যি, আল্লাহর অপার মহিমার সীমা-পরিসীমা নাই। বিশ্ব ভুবনে যা কিছু আছে সব তাঁরই দান। আর তাই এ বিশ্বের সব কিছু চলে তাঁরই হুকুমে। তাঁরই ইশারায় বৃষ্টি নামে। তাঁরই হুকুমে ফসল ফলে মাঠে। এ জন্যই আমরা বলি, দুনিয়া হচ্ছে খোদার রাজ্য। তিনি এ রাজ্যের বাদশাহ। তিনিই এর মালিক। দুনিয়া জুড়ে কেবল তাই তাঁরই কর্তৃত্ব চলে।

www.pathagar.com

দুই ● সৃষ্টি ও স্রষ্টার কথা

আমরা জানি, দুনিয়ার কোন কিছুই একা একা বা নিজে নিজে তৈরী হতে পারে না। এই যে কলম, খাতা, পেন্সিল, বই, চেয়ার, টেবিল– এই যে সাজানো গোছানো বাড়ী-ঘর, কল-কারখানা এগুলো কিছুই একা একা তৈরী হতে পারেনি। এমনকি আমাদের ছোট্ট খেলনাটিও না। এগুলো কেউ না কেউ বানিয়েছেন। তেমনি এ পৃথিবীও নিজে নিজে তৈরী হয়নি। কেউ না কেউ তা বানিয়েছেন। তিনিই আল্লাহ। তিনিই বানিয়েছেন মহাবিশ্ব। বানিয়েছেন বিশ্বের সব কিছু।

এই যে বাগানের ফুল গাছগুলোতে ফুল ফোটে, ফলের বাগানে মজার মজার আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, কলা– আকাশে উড়ে বেড়ায় কত সুন্দর সুন্দর পাখি– দোয়েল, কোয়েল, ময়না, টিয়া, কাকাতুয়া– এদের সবাইকেই সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। তেমনি আমাদেরও বানিয়েছেন তিনিই।

কিন্তু কেউ কি এমনি এমনি কোন কিছু বানায়? না, বানায় না। আমরা জামা বানাই পরার জন্য, কলম বানাই লেখার জন্য, খেলনা বানাই খেলার জন্য। এভাবে যা কিছুই আমরা বানাই না কেন তার পেছনে আমাদের কোন না কোন উদ্দেশ্য থাকেই। আল্লাহ যে এ মহাবিশ্ব বানিয়েছেন তার কি কোন উদ্দেশ্য থাকতে নেই? অবশ্যই আছে। আল্লাহ বলেন, **জ্বীন ও মানুষকে আমি বানিয়েছি আমার এবাদত করার জন্য।**

আল্লাহর এ কথা থেকে আমরা বুঝলাম, জ্বীন ও মানুষকে আল্লাহ বানিয়েছেন তাঁর এবাদতের জন্য। কিন্তু মহাবিশ্বের এতসব সৃষ্টিরাজি আল্লাহ কেন সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ কোরআনের মাধ্যমে সে কথাও আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, **পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য।**

www.pathagar.com

কি চমৎকার কথা তাইনা? এই পৃথিবী আর পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে তার সবকিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। অর্থাৎ পৃথিবীর সব কিছু কেবল আমাদের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে আর আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর এবাদতের জন্য। এ থেকে আমরা দু'টো কথা জানতে পারলাম।

এক. আল্লাহ কেন আমাদের বানিয়েছেন?

দুই. কেন আল্লাহ এ বিশ্ব ও বিশ্বের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন?

তিন ● আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়

পৃথিবীর বেশীর ভাগ মানুষ স্রষ্টায় বিশ্বাসী। এই স্রষ্টাকে কেউ ডাকে আল্লাহ, কেউ ঈশ্বর, কেউ বলে গড। যে নামেই ডাকা হোক না কেন, মূল কথা একটিই– তিনিই আমাদের স্রষ্টা। তবে সব মানুষের স্রষ্টায় বিশ্বাস এক রকম নয়। কারো মতে আল্লাহ অনেকজন, কারো মতে কয়েকজন, কারো মতে মাত্র একজন। যারা বলে আল্লাহ অনেকজন বা কয়েকজন তারা মনে করে, এক আল্লাহ আমাদের আহার জোগান, আরেক আল্লাহ বিদ্যা ও বুদ্ধি দেন, আরেক আল্লাহ হয়তো বিপদে আমাদের রক্ষা করেন। এমনিভাবে একেক আল্লাহ একেক কাজে ব্যস্ত।

কিন্তু তাই কি হয়?

বিষয়টি নিয়ে একটু ভাবা যাক। আমরা জানি, সাতটি মহাদেশ নিয়ে আমাদের এ ছোট্ট পৃথিবী। প্রত্যেক মহাদেশে আছে অনেকগুলো ছোট-বড় দেশ। প্রত্যেক দেশেই আছে একজন করে রাষ্ট্রপ্রধান। একটা দেশে কি একই সাথে দু'জন রাষ্ট্রপ্রধান থাকতে পারেন? না, পারেন না। তেমনি ভাবে একটা স্কুলে কখনো দু'জন হেডমাস্টার

www.pathagar.com

থাকেন না। একটি সেনাদলে দু'জন সেনাপতি থাকেন না। একটা গাড়ির দু'জন ড্রাইভার থাকেন না। কারণ, তাতে বিপত্তি ঘটে, বিশৃংখলা দেখা দেয়, অনিয়ম আর অশান্তি সৃষ্টি হয়।

তাহলে এই যে সুন্দর দুনিয়া, যেখানে ঠিক সময়ে সূর্য উঠে আবার ডুবে যায়, চাঁদ মিষ্টি করে হাসে আবার লুকিয়ে যায়, তারাগুলো মিট্‌মিট্ করে তাকায় রাতের আকাশে। এদের কারো সাথে কারো ধাক্কা লাগে না, কেউ কারো পথ আগলে দাঁড়ায় না, নিয়মের ব্যতিক্রম করে না কেউ একবিন্দু। এমনটি হয় কেন?

কারণ, এদের সবার মধ্যে আছে চমৎকার একতা, আছে নিয়মের বাঁধন। এরা সবাই চলে মাত্র একজনের ইশারায়। হুকুম পালন করে মাত্র একজনের। নিয়ম মতো তাই রাতের পর দিন আসে, নিয়ম মতো সূর্য উঠে, চাঁদ হাসে। এই একজন আর কেউ নন, তিনিই আল্লাহ। **তিনি লা-শরীক। লা-শরীক আরবী শব্দ। লা মানে নাই, শরীক মানে অংশীদার। লা-শরীক মানে হচ্ছে– কোন অংশীদার নাই।** অর্থাৎ আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ একজন না হয়ে দু'জন হলেই দুনিয়ায় তুলকালাম কান্ড ঘটে যেতো।

এ সামান্য কথাটুকু বুঝার জন্য পন্ডিত হওয়ার দরকার পড়ে না। যার মাথায় সামান্য বুদ্ধি আছে সেই এ সহজ কথাটুকু বুঝতে পারে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ নিজেও এ কথাটাই চমৎকারভাবে বলেছেন, **যদি পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা একজন না হয়ে দু'জন হতো তাহলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত।**

এজন্যই আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি কারো পিতা নন, আবার কেউ তাঁর পিতা নন। এ পৃথিবীর সব কিছু নশ্বর– সব কিছু ধ্বংসশীল। কিন্তু আল্লাহ অবিনশ্বর। তাঁর ধ্বংস নেই, বিনাশ নেই। তিনি চিরকাল ছিলেন, চিরকাল আছেন এবং একমাত্র তিনিই চিরকাল থাকবেন।

www.pathagar.com

এ আল্লাহকে চোখে দেখা যায় না। কারণ, আল্লাহকে দেখার জন্য যে ধরনের শক্তিশালী চোখ দরকার, সে ধরনের শক্তিশালী চোখ পৃথিবীতে কারোরই নেই। আমরা বিশ্বাস করি, মৃত্যুর পর আল্লাহ তার মুমিন বান্দাদের চোখের শক্তি বাড়িয়ে দিবেন, তখন মুমিনগণ আল্লাহকে দেখতে পাবে। আমরা আরো বিশ্বাস করি, আল্লাহই আমাদের একমাত্র স্রষ্টা। তিনিই আমাদের মাবুদ, মুনীব। তিনিই আমাদের জীবন দান করেন। আবার তাঁর কাছেই আমাদেরকে একদিন ফিরে যেতে হবে।

চার ● মানুষের পরিচয়

পৃথিবীর আর সব কিছুর মত মানুষকেও তৈরী করেছেন আল্লাহতায়ালা। তিনি মানুষকে শুধু তৈরীই করেন নি, তাকে দিয়েছেন বিবেক ও বুদ্ধি। দিয়েছেন ভাল ও মন্দ পার্থক্য করার ক্ষমতা। দিয়েছেন অফুরন্ত মর্যাদা ও সম্মান। **আল্লাহর চোখে মানুষ সকল সৃষ্টির সেরা– আশরাফুল মাখলুকাত।**

আমাদেরকে মানুষ হিসাবে যিনি তৈরী করেছেন, সেই মহান আল্লাহর ইচ্ছাতেই আমরা দুনিয়াতে এসেছি। আবার তাঁরই ইশারায় আমাদেরকে দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে। এই আসা ও যাওয়ার মাঝ পথের সময়টুকু বড়ই মূল্যবান। শুধু শুধুই তিনি আমাদেরকে এখানে পাঠান নি। এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে অতি উচ্চ মর্যাদা দিয়ে তিনি আমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন।

কি সেই মর্যাদা? সে মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে দুনিয়ায় তাঁর খলিফা হিসেবে পাঠিয়েছেন। খলিফা অর্থ প্রতিনিধি। এর অর্থ হলো, দুনিয়াতে আমরা আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ

www.pathagar.com

করবো।

কি কাজ করবো? আল্লাহ বলেছেন, জ্বীন ও মানুষকে আমি সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদাত করার জন্য। এ ইবাদতের অর্থ হচ্ছে তাঁর হুকুম মত জীবন চালানো।

আল্লাহ আমাদের শুধু স্রষ্টাই নন– আমাদের মালিক এবং মুনীবও। তার মানে আমরা আল্লাহর বান্দা। বান্দা মানে গোলাম। গোলামের কাজ হচ্ছে মালিকের হুকুম মেনে চলা। তাই আল্লাহর হুকুম মেনে চলাই আমাদের কাজ। অর্থাৎ আল্লাহ যেসব কাজ করতে বলেছেন, সেসব কাজ আমরা সুন্দর ভাবে করবো আর যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, সেগুলো কখনোই করবো না।

আমরা শুধু আল্লাহর বান্দাই নই– আমরা এ পৃথিবীর স্রষ্টা মহান আল্লাহপাকের মনোনীত খলিফাও। খলিফা মানে প্রতিনিধি। এটি কোন চাট্টিখানি কথা নয়। এ পৃথিবীর যিনি রাজাধিরাজ, সকল বাদশাহর যিনি বাদশাহ আমরাই তাঁর প্রতিনিধি। এ যেমন বিশাল মর্যাদার বিষয় তেমনি বিপুল দায়িত্ব এবং কর্তব্যও এর সাথে জড়িত। এ দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর আইন অনুযায়ী দুনিয়াকে পরিচালনা করা। এটা করা না হলে খেলাফতের বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করা হবে না। তাই, আল্লাহর খলিফা হিসাবে এ কাজও আমাদের অবশ্যই করতে হবে।

আল্লাহর ভাষায় আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি– আশরাফুল মাখলুকাত। কি বিস্ময়কর কথা! জ্বীন নয়, ফেরেশতা নয়, অন্য কোন প্রাণী বা জিনিস নয় আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হচ্ছে মানুষ! এ কথা বলার মানে কি? এ বিষয়টা একটু ভাল ভাবে বুঝতে হবে। তিনটি মৌলিক কারণে মানুষকে আল্লাহ এ মহান মর্যাদা দিয়েছেন।

এক. মানুষ ছাড়া আল্লাহ আর কাউকে স্বাধীনতা দেননি, ইচ্ছাশক্তি দেননি। এই স্বাধীনতা বা ইচ্ছাশক্তি থাকায় মানুষ ভাল বা

www.pathagar.com

মন্দ যে কোন কাজ করার সুযোগ পায়। অন্য কোন প্রাণী এ সুযোগ পায়না। অন্যরা অনেকটা রোবটের মত। তাদের স্বাধীন কোন ইচ্ছা নেই। যে কাজ করতে বলা হয় তারা শুধু সেই কাজটুকুই করতে পারে।

দুই. আল্লাহ মানুষকে বিবেক ও বুদ্ধি দিয়েছেন। ভাল ও মন্দকে পার্থক্য করার ক্ষমতা দিয়েছেন। যে ক্ষমতাবলে মানুষ ভালকে চিনতে পারে, মন্দকে চিনতে পারে এবং সেই অনুযায়ী চলতে পারে।

তিন. স্রষ্টা তাঁর নিজের গুণে মানুষকে গুণান্বিত করেছেন। তার মধ্যে সৃজনশীলতা দিয়েছেন, যে সৃজনশীলতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। আল্লাহ চান মানুষ তার সৃষ্টিশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে আল্লাহর অপার সৃষ্টি রহস্য আবিষ্কার করুক। তাইতো আল্লাহ মানুষকে ডেকে বলেন, **তোমরা আল্লাহর রঙে রঙিন হয়ে ওঠো।** এভাবেই আল্লাহ মানুষকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মর্যাদা দিয়েছেন। তাই মানুষ মানুষের গোলামও নয় প্রভুও নয়। গোলামী যদি করতেই হয় তাহলে পৃথিবীর সব সৃষ্টি যার গোলামী করে মানুষও গোলামী করবে কেবল তাঁর। সকল বাদশাহর যিনি বাদশাহ মানুষের বন্দেগী সেই অসীম সত্ত্বার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হতে পারে।

এভাবেই আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন অসীম মর্যাদা। এ মর্যাদা রক্ষা করতে হলে দরকার নিজে আল্লাহর আইন অনুযায়ী চলা এবং দুনিয়ায় আল্লাহর আইন চালু করার চেষ্টা করা।

পাঁচ ● আল্লাহর আইন

আমরা দেখতে পাই পৃথিবীর সবকিছুই নিয়ম মাফিক চলে– কোথাও অনিয়মের উপায় নেই। যেখানেই অনিয়ম সেখানেই অশান্তি।

www.pathagar.com

কিন্তু এই নিয়ম জিনিসটা কি? এই নিয়মটা আমরা পেলাম কই? সত্যিই এটি একটি ভাবার বিষয়।

ধরি, বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা, ফ্রিজ, টেলিভিশন, রেডিও বা এ ধরনের যে কোন জিনিস। যারা এগুলো বানিয়েছেন তারা এগুলো চালানোর নিয়ম-কানুনও লিখে দিয়েছেন বা বলে দিয়েছেন। তাঁরা যেভাবে বলেছেন সেভাবে চালাই বলেই ওগুলো চলে। আমরা যদি এসব জিনিস নিয়ম অনুযায়ী না চালাই– যেমন বৈদ্যুতিক পাখার সুইচ না টিপে হাত দিয়েই চালানোর চেষ্টা করি অনেকটা হাতপাখা চালানোর স্টাইলে, তাহলে পাখাটি হয়তো ঘুরবে, কিন্তু পাখার শীতল করা বাতাস কি আমরা পাবো? নিশ্চয়ই পাবো না। বরঞ্চ হাত দিয়ে জোর করে চালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে ঘেমে নেয়ে উঠবো নিজেই। এ করতে গিয়ে আমরা ব্যথা পেতে পারি, হাত কেটে যেতে পারে, রক্ত ঝরতে পারে, ইলেকট্রিক শক্-এ মারাও যেতে পারি। নিয়মের এ দুনিয়ায় নিয়ম মেনে না চললে এমনি সব বিপত্তি ঘটে।

আমাদেরকে যিনি বানিয়েছেন তিনিও আমাদের চলার নিয়ম ঠিক করে দিয়েছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা কিভাবে চলবো, কি করবো, কি খাবো সবই তিনি ঠিক করে দিয়েছেন। এই ঠিক করে দেয়া নিয়মটাই হচ্ছে আল্লাহর আইন বা আল্লাহর বিধান। আর সে বিধানের নাম ইসলাম। এই ইসলাম যদি আমরা মেনে চলি, তবে আমরা পাবো কেবল শান্তি আর শান্তি। আবার ইসলাম মেনে চলতে না পারলে আমরা পাবো অশান্তি, দুঃখ-বেদনা, হতাশা, নিরাশা, বিপর্যয়, ধ্বংস আর অধঃপতন।

আমরা দেখতে পাই, আকাশে-বাতাসে প্রকৃতির মাঝে বিরাজ করছে শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা। কারণ হচ্ছে, এরা সবাই আল্লাহর দেয়া নিয়ম নীতি ঠিক ঠিক মত মেনে চলছে। মেনে চলছে আল্লাহর দেয়া আইন। সেই যে রোবটের কথা বলেছি তার মত। আল্লাহর আইনের

www.pathagar.com

বিপরীতে চলার কোন সামর্থ্য তাদের নেই। তারা চলে তাদের স্বভাবধর্ম অনুযায়ী। আগুন সবকিছু পুড়িয়ে দেয়, পানি পিপাসা মিটায়, খাদ্য জীবন বাঁচায়। তাই সেখানে কোন অশান্তিও নেই।

মানুষেরও আছে স্বভাবধর্ম। তার সে স্বভাবধর্ম হচ্ছে ইসলাম। ইসলামকে মানা মানেই আল্লাহর আইন অনুযায়ী চলা। আল্লাহর আইন অনুযায়ী চললে আমাদেরও আর কোন দুঃখ থাকবে না।

ছয় ● আজকের দুনিয়া

কিন্তু আজকের দুনিয়ায় আমরা কি দেখি? আমরা একটু চোখের আড়াল হলেই আব্বু আম্মু চিন্তা করেন। স্কুলের কচি বাচ্চাগুলোকে ছেলেধরার দল নিয়ে পালিয়ে যায়। অনেক ছোট্ট শিশুরা স্কুলে যেতে পারে না। ভালো পোষাক পরতে পারে না। ভালো খাবার খেতে পায় না। চারদিকে মারামারি, কাটাকাটি, হাইজ্যাক, খুন, সন্ত্রাস লেগেই আছে। দেশে দেশে যুদ্ধ। জাতিতে জাতিতে বিবাদ।

ফিলিস্তিনের ছোট্ট শিশুদের চোখে আজ কান্না। কচি শিশুদের আহাজারিতে ভরে আছে কাশ্মীর, বসনিয়া, রুয়াণ্ডার শরণার্থী শিবির। কারো বাপ নেই, কেউ হারিয়েছে মা, ভাই, বোন। তাদের কোন খাবার নাই, অসুখে ওরা ওষুধ পায় না, চিকিৎসা পায় না। তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। আজ ওরা অসহায়।

অত দূরে যাবার দরকার কি? রাজধানীর ফুটপাতে, রেল লাইনের ধারে, নোংরা বস্তিতে আমাদের দেশেও আজ হাজার হাজার শিশু অপুষ্টির শিকার। ইস্কুলে না গিয়ে পেটের দায়ে কাজ করে খায় কত কচি শিশু। তারা ক্ষুধায় কষ্ট পায়, অসুখে কষ্ট পায়, শীতে কষ্ট পায়। রোদ বৃষ্টিতে ভিজে অসুখে বিসুখে অকালে প্রাণ হারায়।

www.pathagar.com

কেন এত দুঃখ যন্ত্রণা? কেন এ না পাওয়ার বেদনা? কেন শান্তি নেই মানুষের মনে? মানুষের জীবনে?

প্রতিদিনের খবরের কাগজ কেন দুঃখময় অসংখ্য ঘটনার খবরে ভরা থাকে? কেন থাকে না ভালো ভালো আনন্দময় খবরের বর্ণনা? যে আল্লাহ আমাদের বানিয়েছেন তিনি তো সবার ভালো চান। তবু কেন এত কষ্ট? এসব কথা আজ আমাদের ভাবতে হবে। ভাবতে হবে কেন এ অশান্তি আর কষ্ট। কেন দুনিয়া জুড়ে মানুষের এত হাহাকার। কেন এ অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে? কি এর মূল কারণ? এ দুঃখ কষ্ট থেকে বাঁচার কি কোন পথ নেই? থাকলে সে কোন পথ?

সাত ● অশান্তির কারণ

একটু চিন্তা করলেই আমরা দেখি, আমরা নিজে যদি আম্মুকে কষ্ট না দেই আম্মু দুঃখ পাবে না, আব্বুকে কষ্ট না দিলে আব্বুও দুঃখ পাবে না, পৃথিবীর কাউকেই যদি কষ্ট না দেই, কেউই অন্ততঃ আমার কাছ থেকে দুঃখ পাবে না। ঠিক তেমনি, সব মানুষ যদি কাউকেই কষ্ট না দেয়ার কথা চিন্তা করতো, তাহলে পৃথিবীতে আর কষ্ট থাকতো না। সবাই সুখে থাকতো, সবাই আনন্দে থাকতো। দুনিয়ায় বিরাজ করতো বেহেশতের মত অনাবিল শান্তি আর শান্তি।

কিন্তু তা হয়নি কেন? হয়নি এ জন্য যে, মানুষকে বিপথগামী করার জন্য আছে এক শয়তান। আল্লাহ যেদিন থেকে দুনিয়ায় মানুষ পাঠিয়েছেন সেদিন থেকেই শয়তান মানুষের পেছনে লেগেছে। মানুষকে সে ভুল পথে টানে, অন্যায় ও খারাপ পথে ডাকে। মানুষের সুখ শান্তি বিনাশ করে মানুষকে দুঃখ আর কষ্টে ফেলাই তার একমাত্র কাজ।

www.pathagar.com

মানুষ যাতে আল্লাহর পথে না চলে সে জন্য শয়তান সব সময় তৎপর। নানা ভাবে সে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। অনেক সময় মানুষ টেরও পায় না যে সে আল্লাহর পথ ছেড়ে শয়তানের পথে চলছে।

আল্লাহ বলেছেন, জ্বিন ও মানুষকে আমি সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য। মানুষ সৃষ্টির এটাই একমাত্র উদ্দেশ্য। অথচ মানুষ সবাই সব সময় এ কথা স্মরণ রাখে না। তারা আল্লাহর দেয়া নিয়ম মতো তাদের জীবন চালায় না। নিজের জীবনে, আপন সমাজে এবং রাষ্ট্রে আল্লাহর দেয়া আইন অনুযায়ী চলে না বলেই সৃষ্টি হয় নানা অশান্তি।

সমাজে এ ধরনের অশান্তি সৃষ্টি হলে আল্লাহ মানুষকে সৎ পথে, আনার জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। তারা মানুষকে দেখিয়েছেন অশান্তি ও দুঃখ থেকে বাঁচার উপায়। যুগে যুগে যারা তাঁদের দেখানো পথে চলেছে তারা পেয়েছে সুখ ও শান্তির ঠিকানা। পেয়েছে অনাবিল আনন্দের উৎসধারা। দুনিয়ার জীবনে তাঁরা সফলতা পেয়েছে, সফলতা পেয়েছে আখেরাতের জীবনে। আজো যদি মানুষ নবীর দেখানো পথে চলে তবে পৃথিবীতে আর কোন অশান্তি থাকবে না, থাকবে না দুঃখ ও কষ্টের লেশ। নবীর দেখানো পথই হচ্ছে জীবনকে সার্থক ও সফল করার একমাত্র পথ।

আট ● নবী রাসূলদের কথা

পৃথিবীর প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ.)। আল্লাহ তাঁকে নবী করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। আদম (আ.)-এর সাথী ছিলেন বিবি হাওয়া (আ.)। সেই থেকে মানব জীবনের শুরু। তাঁরা প্রথমে ছিলেন বেহেশতে। তাদেরকে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ ফেরেশতাদের ডেকে

www.pathagar.com

তাদেরকে সেজদা করতে বললেন। সকল ফেরেশতা তাঁদের সেজদা করলো কিন্তু একজন বাদে। সে অহংকার করে আল্লাহর হুকুম অমান্য করলো। আল্লাহ তাকে অভিশাপ দিলেন। সেই থেকে সে হলো ইবলিস বা শয়তান।

আল্লাহ তাকে বেহেশত থেকে তাড়িয়ে দিলেন। এবার মানুষের পেছনে লাগলো শয়তান। সে ঘোষণা করলো, **আমি মানুষের (অনিষ্ট করার জন্য) সামনে থেকে আসবো, পেছন থেকে আসবো, ডাইনে থেকে আসবো, বায়ে থেকে আসবো।** আল্লাহ বললেন, **তুমি মানুষের পেছনে লেগে থাকতে পারবে, তবে সেই সব মানুষের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না, যারা আমার ওপর ঈমান আনবে এবং আমার আইন কানুন মেনে চলবে।**

মানুষের অনিষ্ট ও ক্ষতি করার জন্য উঠেপড়ে লাগলো শয়তান। শয়তানের প্ররোচনায় একজন দু'জন করে মানুষ আস্তে আস্তে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলো। এভাবে পৃথিবীতে সৃষ্টি হলো দু'দল মানুষের। একদল হলো আল্লাহর বান্দা, আরেক দল শয়তানের গোলাম।

শয়তানের কুবুদ্ধিতে পড়ে যেসব মানুষ আল্লাহকে ভুলে গেল তাদেরকে আবার আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনার জন্য আল্লাহ নবী ও রাসূল পাঠানো শুরু করলেন। তারা মানুষকে দিলেন সুখ-শান্তির ঠিকানা, দেখালেন মুক্তির পথ।

যুগে যুগে এভাবে অনেক নবী ও রাসূল দুনিয়ায় এসেছেন। মানুষ একবার নবী ও রাসূলদের কথা শুনে এসেছে ভালোর পথে, কিছুদিন পর আবার শয়তানের কুবুদ্ধিতে পড়ে ছেড়েছে আল্লাহর পথ। যুগ যুগ ধরে এই-ই চলে এসেছে। পৃথিবীর ইতিহাস তাই সত্য ও মিথ্যার লড়াইয়ের ইতিহাস, হক ও বাতিলের সংঘাতের ইতিহাস। এ লড়াইয়ে সত্যপন্থীদের পথ প্রদর্শনের জন্য পৃথিবীর নানা দেশে নানা

www.pathagar.com

সময়ে এভাবে এসেছেন অনেক নবী ও রাসূল। তাদের সংখ্যা এক লক্ষ বা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার। সবশেষে নবী হয়ে এলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তারপর আর কোন নবী আসবেন না। তিনিই আখেরী নবী, সর্বশেষ নবী। তাই তাকে বলা হয় খাতামুন্নাবিঈন।

তিনি নবী ও রাসূলদের সর্দার। তিনিই আমাদের নেতা। আমাদের সকল সুখ ও শান্তির মূলে আছেন তিনি। তাঁর জীবন উত্তম জীবন। তাঁর জীবনই সফল জীবন। যারা তাঁর মত জীবন গড়বে তারাও হবে সফল। আল্লাহতায়ালা নিজেই বলেছেন, **নিশ্চয়ই রাসূল (সা.)-এর জীবনেই তোমাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম নমুনা বা আদর্শ।**

আমরা হাতের লেখা সুন্দর করার জন্য সুন্দর হাতের লেখা দেখে দেখে লিখি। তেমনি আমাদের জীবনকে সুন্দর করতে হলেও একটি সুন্দর জীবন দেখে তাঁর মত করে আমাদের জীবনকে গড়ে তুলতে হবে। সেই সুন্দর জীবনই হলো রাসূলের জীবন, নবীর জীবন।

আমরাও তাঁর মত জীবন গড়তে চাই। তার মত হতে চাই সুন্দর মানুষ। তার মত চরিত্রে সুন্দর, সততায় সুন্দর, ব্যবহারে ও ভদ্রতায় সুন্দর। কথায় ও কাজে হতে চাই তাঁরই মত। তাই তাঁর জীবন দেখে দেখে আমাদের জীবনকে সেই ভাবে গড়ে তুলতে হবে। তিনি কেমন ছিলেন? এবার আমরা সে কথাই আলোচনা করবো।

নয় ● মহানবীর শিশুকাল

রাসূল (সা.) যখন ছোট ছিলেন, তখন কি করতেন? নিশ্চয়ই সবারই এটা জানতে ইচ্ছে করছে। কারণ আমরা তো তাঁরই মত হতে চাই।

www.pathagar.com

তিনি ছোটবেলায় কখনো মিথ্যা কথা বলেননি। কারো সাথে ঝাগড়া-ঝাটি ও মারামারি করেননি। কাউকে গালি দেননি। তিনি বড়দের কথা শুনতেন। বড়দেরকে শ্রদ্ধা করতেন। তাই সবাই তাঁকে আদর করতো। লোকে তাঁকে যত ভালো বলতো, তিনি তার চাইতেও বেশী ভালো হয়ে চলতেন।

তিনি সব সময় নিজে ভালো ভালো কথা বলতেন, অন্যদেরও ভালো কথা বলার শিক্ষা দিতেন। তিনি কারো সাথে কখনো খারাপ ব্যবহার করেননি। কাউকে তিনি ঘৃণা করতেন না। অসহায় ও গরীব লোকদেরকে তিনি সাহায্য করতেন।

মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম ভালবাসা। তাই কেউ কাউকে কষ্ট দিলে তিনি কষ্ট পেতেন। আরবের সে সময়ের সমাজ ছিল বর্বর সমাজ। খুনোখুনি, হানাহানি লেগেই থাকতো। তিনি এর প্রতিকার করতে চাইলেন। কিন্তু কিভাবে করবেন? একা একা তো আর খুনি লোকদের তিনি ঠেকাতে পারবেন না। তাই কিশোর বয়সেই তিনি শিশু-কিশোরদের নিয়ে হিলফুল ফুজুল নামে একটি সংগঠন করলেন। অসহায় ও নির্যাতীত মানুষদের সহায়তা করাই ছিল এ সংগঠনের মূলমন্ত্র।

তিনি যেমন ছিলেন সাহসী তেমনি ছিলেন বুদ্ধিমান। কাবাঘর মেরামত নিয়ে বিবাদের মিমাংসার কাহিনী সকলেরই জানা। বালক বয়সেই তিনি সত্যবাদিতার জন্য আলআমীন খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন। শিশুকাল হচ্ছে ভবিষ্যত জীবনের প্রস্তুতি কাল। ভাল মানুষ মানে নিরীহ মানুষ নয়, বরং অন্যায়ের মোকাবেলা করার হিম্মতওয়ালা সামর্থবান মানুষ। আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন, **তোমরা ভাল কাজের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজ থেকে মানুষকে প্রতিহত কর।** এই প্রতিহত করার কাজটা বড় কঠিন। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। এই জন্য প্রয়োজন হয় শক্তির,

www.pathagar.com

প্রয়োজন হয় যুদ্ধের। বড় হয়ে মহানবীকেও অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছিল। বালক বয়সে হিলফুল ফুজুল-এর মাধ্যমেই বড় হয়ে তিনি যে সেনাপতি হবেন তারও ট্রেনিং পেয়েছিলেন। এভাবেই আমাদেরও জীবন গড়ে তুলতে হবে ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজকে প্রতিহত করার জন্য।

দশ ● মহানবীর কথা

শিশু নবী কৈশোর পেরিয়ে তারুণ্যের পথে পা বাড়ালেন। যতই তিনি বড় হন ততই তাঁর মনে ভিড় করে আসে নানা প্রশ্ন। তিনি ভাবেন, কোন কিছু সৃষ্টি হতে গেলেই একজন স্রষ্টা লাগে। যদি তাই হয় তাহলে আমাদেরও একজন স্রষ্টা আছেন। কে সেই স্রষ্টা? আমরা তো এমনি এমনি কোন কিছু বানাই না। তাহলে যিনি আমাদের বানিয়েছেন তিনিও নিশ্চয়ই অযথাই আমাদের বানান নি। তাহলে কেন বানালেন? যতই তিনি এসব ভাবেন ততই আরো বেশি করে ভাবনা এসে জড়িয়ে ধরে তাঁকে।

এসব ভাবার জন্য তিনি একটি নির্জন জায়গা বেছে নিলেন। হেরা পর্বতের এক নির্জন গুহায় গিয়ে ধ্যান করা শুরু করলেন তিনি। সেখানেই তিনি পেলেন আল্লাহর প্রথম অহি। একদিন তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছেন এমন সময় জিবরাইল ফেরেশতা এসে তাঁকে বললেন, পড়। তিনি বললেন, আমি তো পড়তে জানিনা।

জিবরাইল (আ.) আবার বললেন, পড়।

তিনিও আবার বললেন, আমি পড়তে জানিনা।

তখন জিবরাইল (আ.) তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, পড় তোমার প্রভুর নামে। সেই থেকে অহি আসা শুরু।

www.pathagar.com

এরপর তিনি আরো তেইশ বছর বেঁচেছিলেন এবং এই তেইশ বছর ধরে তাঁর ওপর আল্লাহ অহি নাজিল করতে থাকেন। সেই সব অহির মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর মনের সকল জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছেন। কেন মানুষকে বানিয়েছেন আল্লাহ, কেন বানিয়েছেন দুনিয়ার আর সবকিছু এই সব কথা আল্লাহ তাঁকে বলেছেন। বলেছেন, দুনিয়ায় মানুষ কিভাবে থাকবে, কি করবে, কি পরবে, কি খাবে, কিভাবে চলবে সেই সব কথা।

যারা তাঁর কথামত চলবে পরকালে তারা পাবে পুরস্কার আর যারা চলবে না তারা পাবে শাস্তি। এসব কথা বলার পর আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়ায় আল্লাহ আর কোন নবী পাঠাবেন না, তিনিই শেষ নবী। কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের কাজ হচ্ছে এই শেষ নবীর অনুসরণ করা। যারা যথার্থভাবে তাঁর অনুসরণ করবে দুনিয়া ও আখেরাতে তারাই হবে সফলকাম। মহানবীও তাঁর জীবনের শেষ ভাষণে সে ডাকই দিয়েছেন আমাদের।

বিদায় হজের ভাষণে তারঁ অন্তিম নসীহতে তিনি বলে গেছেন, **হে মুসলমান সকল! আমি তোমাদের জন্য দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতদিন এ দুটো তোমরা আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন তোমাদের কোন অনিষ্ট হবেনা। তার একটি হচ্ছে আল্লাহর কোরআন আর অপরটি হাদীস। মানুষের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে আল্লাহর এ কোরআনে ও রাসূলের সুন্নাহতে।**

এগার ● কোরআন ও সুন্নাহর কথা

আল্লাহ মহানবীর কাছে যত অহি পাঠিয়েছেন সেগুলো লিপিবদ্ধ আছে কোরআনে। এই কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া মানুষের

www.pathagar.com

জন্য এক নির্ভুল জীবন বিধান। মুসলমানদের একমাত্র সংবিধান। এই কোরআনেই আছে মানুষের জন্য আল্লাহর সব হুকুম আহকাম। মানুষের জন্য দেয়া তাঁর সমুদয় আদেশ নির্দেশ।

তাই আল-কোরআনই হচ্ছে মহামুক্তির মহাপথ- মুক্তির রাজপথ। এর গুণ ও বৈশিষ্ট্য উপমাবিহীন। এতে কল্পনা বা ধারণামূলক কোন উক্তি স্থান পায়নি। এমন কোন বাক্যও নেই যা অনুমান ভিত্তিক অথবা অর্থহীন। দুই আর দুই মিলে যেমন শুধু চারই হয় তদ্রুপ সর্বশক্তিমান খোদা প্রেরিত আল কুরআনের প্রত্যেকটি শব্দ সত্য ও সুন্দরের প্রতীক ও বাস্তব নিদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। কোরআন সম্পর্কে আল্লাহ পাক নিজেই বলেছেন, **এটা আল্লাহতায়ালার কিতাব, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ... অতঃপর যারা এর (এই কিতাবের) অনুসরণ করবে তাদের জন্য দুঃখ বা চিন্তার কোনই কারণ নেই।**

আল্লাহর আইন মানছে বলেই আকাশে বাতাসে রয়েছে শান্তি, কিন্তু মানুষ আল্লাহর আইন অর্থাৎ আল কোরআনের পরিবর্তে নিজেরাই নিজেদের চলার আইন বানিয়ে নিয়েছে বলেই মানুষের জীবনে বিরাজ করছে চরম অশান্তি। মানুষ যতদিন আল-কোরআনকে আঁকড়ে না ধরবে, ততদিন এ অশান্তি দূর হবার নয়।

আল কোরআনের মত করে জীবন গড়তে নিশ্চয়ই আমাদের খুব ইচ্ছে করে, তাই না? কিন্তু কার অনুসরণ করলে আল-কোরআনের মত হবে? মহান আল্লাহতায়ালা নিজেই বলছেন, **নিশ্চয়ই রাসূল (সা.)-এর জীবনেই তোমাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম নমুনা বা আদর্শ।** বস্তুতঃ রাসুল (সা.)-এর জীবন হচ্ছে জীবন্ত কোরআন। এই কোরআনের বাস্তব চিত্র হচ্ছে মহানবীর জীবন। আর মহানবীর জীবনের বিশ্বস্ত দলীল হচ্ছে আল কোরআন।

অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা কোরআনে যেভাবে চলতে বলেছেন,

www.pathagar.com

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঠিক সেইভাবে চলেছেন। আমরা সুন্দরভাবে রাসূর (সা.)-এর অনুসরণ করতে পারলেই আল-কোরআনের অনুসারী হতে পারবো। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় কোরআনের অনুসরণ করলেই রাসূল (স.)-এর অনুসরণ করা হবে।

কিন্তু কোরআনে কি আছে না জানলে আমরা তার অনুসারী হবো কি করে? সে জন্যই আল্লাহ প্রথম বাণীতেই বলেছেন, পড়। শুধু তাই নয়, আল্লাহ্ জ্ঞান অর্জন করাকে ফরজ করেছেন। এ জ্ঞান অর্জন ফরজ কেবল পুরুষের জন্য নয়, নারীদের জন্যও। যারা ঈমান আনবে, হোক সে পুরুষ, হোক সে নারী– সবার জন্যই আল্লাহর এ হুকুম।

আমাদেরকে তাই কোরআন পড়তে হবে। কিন্তু আরবী তো আমরা বুঝি না। এজন্য যতক্ষণ আমরা আরবী বুঝতে না পারবো ততক্ষণ আমাদের পড়তে হবে কোরআনের তাফসীর। পড়তে হবে রাসূলে করীম (সা.)-এর জীবনী আর পড়তে হবে প্রখ্যাত মনিষীদের লেখা ইসলামী বই-পুস্তক। তাহলেই আমরা জানতে পারবো আল্লাহর আইন সম্পর্কে, জানতে পারবো ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কে। আর সে আলোকে আমাদের জীবনকে গড়ে তুলে জীবনকে করতে পারবো সুন্দর ও সফল। শুধু ইহকাল নয়, এর ফলে ধন্য হবে ইহ ও পরকাল। সফল হবে আমাদের দুনিয়ার জীবন। সফল হবে আমাদের মৃত্যুর পরের জীবন।

বার ● মৃত্যুর পরের জীবন

আমাদের প্রিয় রাসূল (সা.) ১৪০০ বছর আগে পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং ৬৩ বছর বয়সে পৃথিবী থেকে চলে গেলেন। এভাবে

www.pathagar.com

পৃথিবীতে যারাই আসে, সবাইকেই এই মায়াভরা পৃথিবী ছেড়ে একদিন চলে যেতেই হবে। কবির ভাষায়ঃ

'যেতে নাহি দিব হায়
তবু যেতে দিতে হয়
তবু চলে যায়।'

কিন্তু পৃথিবী ছেড়ে মানুষ কোথায় যায়? পৃথিবী ছেড়ে মানুষ যেখানে যায়, সেটার নাম পরকাল বা আখেরাত। সেটাই মৃত্যুর পরের জীবন। সেই জীবনটা কিন্তু পৃথিবীর জীবনের মত নয়। পৃথিবীটা হচ্ছে কাজের জায়গা আর পরকাল সেই কাজের ফল ভোগের স্থান।

বিষয়টি খুব সোজা। কেউ কাউকে কোথাও প্রতিনিধি পাঠালে প্রতিনিধিতো আর চিরকাল সেখানে থাকে না। কাজ শেষ করে আবার ফিরে আসে যিনি পাঠিয়েছিলেন তার কাছে। আমরাতো আল্লাহর প্রতিনিধি। আমরাও চিরকাল এখানে থাকবো না। ফিরে যাবো আল্লাহর কাছে। পৃথিবীর লোকদের লক্ষ্য করে আল্লাহ নিজেই বলেছেন, একদিন আবার আমার কাছেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে। এজন্যই কেউ মারা গেলে আমরা পড়ি, **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন**। এর অর্থ হচ্ছে, **আমরা আল্লাহরই জন্য এবং আবার তাঁর কাছেই আমরা ফিরে যাবো।**

এই ফিরে যাওয়াটাই কি শেষ? না, যে জন্য আমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল সে কাজের কতটুকু কি করেছি সেখানে তার হিসাব দিতে হবে।

আল্লাহ আমাদের মালিক ও মুনীব। আমরা তার বান্দা বা গোলাম। গোলাম তার কাজের বিনিময়ে মালিকের কাছ থেকে মজুরী পায়। পরকাল হচ্ছে সেই মজুরী পাওয়ার জায়গা। অথবা অন্যভাবে বলা যায়, দুনিয়া হচ্ছে পরীক্ষার হলঘর আর পরকালটা হচ্ছে পরীক্ষার ফলাফল পরবর্তী জীবন।

www.pathagar.com

আমাদের ভুললে চলবে না যে, কোন মালিক তার চাকরকে কোন কাজ দিলে সে যদি কাজটি ঠিকমত না করে তাহলে তাকে শাস্তি পেতে হয়। চাকরের কথাই বা বলি কেন? আব্বা, আম্মা বা কোন মুরুব্বী যদি আমাদের কোন কাজের কথা বলে আর আমরা যদি তা না মানি বা না করি তবে আমাদেরও কি শাস্তি পেতে হয়না? আব্বা আম্মা কি রাগ করেননা?

তেমনি আল্লাহর কথা না মানলে, আল্লাহর পথে না চললে বা আল্লাহর দেয়া কাজ না করলে আল্লাহও অসন্তুষ্ট হবেন এটাই স্বাভাবিক। বস্তুতঃ এই দুনিয়ার সাফল্যই একমাত্র সাফল্য নয়– পরকালের সাফল্যই আসল সাফল্য। আল্লাহ বলেন, **এই দুনিয়ার জীবন তো কিছুই নয় বরঞ্চ একটা খেলা ও মন ভুলানোর ব্যাপার মাত্র, আসলে জীবনের ঘর তো পরকাল। হায়, এই লোকেরা যদি তা জানতো!**

আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের দুই কাঁধে দুই ফেরেশতা আছেন। পৃথিবীতে আমরা যা কিছুই করিনা কেন তারা সব লিখে রাখেন। তারপর যেদিন কেয়ামত হবে, যেদিন হাশরের মাঠে বিচারকের আসনে বসবেন আল্লাহ, সেদিন পৃথিবীতে আমরা যা কিছু করেছি সব তুলে ধরা হবে তাঁর সামনে।

সেখানে আমাদের পাপ ও পূণ্যের হিসাব হবে। সেখানে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার কেউ থাকবে না। সাফাই গাওয়ার জন্য থাকবে না কোন উকিল। সেদিন মানুষের প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গ কথা বলবে। দুনিয়ায় ভাল বা মন্দ যা কিছুই করেছি সব বলে দেবে আল্লাহর কাছে। তারপর আল্লাহ বিচার করবেন। সে বিচার হবে ইনসাফের বিচার। সেদিন আল্লাহর সেই বিচারে যাদের পাপের পাল্লা ভারী হবে তারা পাবে শাস্তি আর যাদের পূণ্যের পাল্লা ভারী হবে তারা পাবে পুরস্কার। সেই শাস্তি ও পুরস্কারের জন্যই আল্লাহ বানিয়ে রেখেছেন দোযখ ও বেহেশত।

www.pathagar.com

আখেরাতে মানুষের দুনিয়ার জীবনের সব কাজের হিসাব নেয়া হবে। যারা কোরআনের পথে কাটিয়েছে নিজেদের জীবন, সেদিন তাদেরকে দেয়া হবে অন্তহীন পুরস্কার। আর সে পুরস্কার হবে জান্নাত। বেহেশতের গুলবাগিচায় তাদেরকে থাকতে দেয়া হবে। তাদের সেবার জন্য থাকবে অসংখ্য হুর-পরী। থাকবে সুমিষ্ট ফলের বাহার। থাকবে দুধের চেয়ে সাদা আর মধুর চেয়ে মিষ্টি পানি। সেখানে থাকবে শুধু শান্তি, সুখ আর আরাম। দুনিয়ায় মানুষ এক সময় আরাম পায় আর এক সময় কষ্ট পায়, কিন্তু বেহেশতে কোন কষ্ট নাই। সেখানে শুধুই সুখ, শুধুই শান্তি। সেই অনন্ত সুখ আর শান্তির রাজ্যে থাকবে পূণ্য পথের যাত্রীরা। থাকবে আল্লাহর পথের পথিকরা। থাকবে যারা পালন করেছে খিলাফতের কঠিন দায়িত্ব। শয়তানের প্রলোভন যাদেরকে সরাতে পারেনি আল্লাহর পথ থেকে।

আর যারা দুনিয়ার জীবনে আল-কোরআনের বিধান মানেনি, নবীর দেখানো পথে চলেনি তাদেরকে দেয়া হবে কঠিন শাস্তি। তারা থাকবে দোযখ বা জাহান্নামে। সেখানে শুধু কষ্ট আর কষ্ট। আগুনের লেলিহান শিখা। রক্ত আর পুঁজের সাগর। সামান্যতম আরামও কখনো সেখানে পাওয়া সম্ভব নয়। সেই কষ্টের সমুদ্রে হাবুডুবু খাবে পাপীদের দল। আল্লাহর কথা ভুলে যারা মত্ত থাকবে দুনিয়ায় তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

আখেরাতের এই জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। যারা জান্নাতে যাবে, তারা চিরকাল আরামেই থাকবে আর যারা জাহান্নামে যাবে, তারা চিরজীবন কষ্টই পাবে। কোটি কোটি বছর এভাবেই চলতেই থাকবে। তাই পরকালের এ জীবনে যারা সুখী হতে চায় তাদের হতে হবে খাঁটি মুমীন। নাহলে দুনিয়াতে যেমন ভোগ করতে হবে অশান্তি আখেরাতে তেমনি ভোগ করতে হবে অনন্ত কষ্ট।

www.pathagar.com

আমরা কেউ কি চাই জাহান্নামের দাউদাউ আগুনে জ্বলতে? যেখানে দেয়া হবে উত্তপ্ত পানি, ক্ষতের ক্ষরণ বা পুঁজ আর রক্ত সেখানে থাকতে? অথবা আমরা কি চাই আমাদের বন্ধুরা ভোগ করুক জাহান্নামের এ কঠিন আজাব? আমাদের ভাই-বোন আত্মীয়রা পাক এ কঠিন শাস্তি? না, চাইনা।

আমরা সবাই চাই জান্নাতের অধিবাসী হতে। চাই মনি-মুক্তা, হীরা-জহরত খচিত বেহেশতের সুরম্য প্রাসাদে বসবাস করতে। চাই জান্নাতের অনাবিল সুখ আর শান্তিতে অবগাহন করতে। আর এর জন্য দরকার আল্লাহকে খুশী করা। দরকার মহান আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি। প্রয়োজন আল্লাহর অনুগ্রহ।

জীবনের সফলতা দামী বাড়ি-গাড়ি আর ঐশ্বর্যে আসে না, জীবনের আসল সফলতা আসে আল্লাহকে খুশী করার মধ্য দিয়ে। পরীক্ষার আগে লেখা পড়ার কষ্ট যে করেনা পরীক্ষা পাশের আনন্দ সে কেমন করে পাবে? মালিকের কাছ থেকে কাজ পাওয়ার পরও যে সে কাজ ফেলে রেখে অন্য কাজ করে মালিকের ক্রোধের হাত থেকে সে কেমন করে বাঁচবে? এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় সামান্য পরীক্ষা পাশের জন্য আমরা কত কষ্ট করি, জীবনের আসল পরীক্ষায় পাশ করার জন্য তারচে বেশী ত্যাগ ও পরিশ্রম করা প্রয়োজন নয় কি? আমরা আমাদের পিতা-মাতা, শিক্ষক, মুরুব্বীদের কথা শুনি। যে আল্লাহ আমাদের বানিয়েছেন, যার হাতে আমাদের জীবন ও মরণ, যার অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করে আমাদের ইহ ও পরকালের কল্যাণ, সেই আল্লাহর হুকুম মত জীবনের প্রতিটি কাজ করা উচিত নয় কি আমাদের?

যদি তাই হয় তাহলে আমাদের করণীয় কি? আমাদের কাজ হচ্ছে নবীর দেখানো পথে চলা। কোরআনের পথে চলা। আল্লাহর

www.pathagar.com

আইনকে নিজের জীবনে, আপন সমাজে আর রাষ্ট্রে কায়েম করা। শয়তানের চ্যালেঞ্জকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আল্লাহর খলিফা হওয়ার মর্যাদাকে সমুন্নত রাখা। এ পথে চলতে হলে এখন থেকেই আমাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ে তোলার আগে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে নিজের জীবন। আর তা করতে হলে এখন থেকেই নিচের কাজগুলো নিষ্ঠার সাথে করার প্রতিজ্ঞা নিতে হবে।

(১) প্রতিদিন অর্থসহ কোরআন পড়া।
(২) প্রতিদিন হাদীস পড়া।
(৩) নিয়মিত মনোযোগ দিয়ে নামায পড়া।
(৪) ইসলামকে ভালোভাবে জানার জন্য ইসলামী বই পড়া।
(৫) নবীর জীবনকে জেনে তাঁর মত জীবন গড়ার চেষ্টা করা।
(৬) মানুষকে ভালোর পথে ডাকা।
(৭) একই সাথে ভাল ছাত্র-ছাত্রী ও ভাল মুসলমানও হওয়া।
(৮) প্রতিদিন কি কাজ করছি তার হিসাব রাখা।

পনর ● মহিয়সী মহিলাদের কথা

ইসলাম এসেছে নারী পুরুষ সকলের জন্য। আল্লাহর হুকুম যেমন পুরুষকে মানতে হয় তেমনি মানতে হয় নারীকে। আল্লাহর খলিফা কেবল পুরুষ নয়, নারীরাও। এ জন্যই ইসলাম নারীকে দিয়েঁছে সীমাহীন মর্যাদা ও সম্মান। দুনিয়ায় ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার যে সংগ্রাম ও সাধনা সে সংগ্রাম ও সাধনার দায়িত্ব নারী পুরুষ উভয়ের। এ দায়িত্ব আল্লাহ নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুসলমানের ওপরই ফরজ করেছেন। এ জন্যই পুরুষের পাশাপাশি এ ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

নারীদের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে আমাদের জানা থাকা দরকার।

ইসলামের ইতিহাসে মহিয়সী মহিলাদের অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। মহানবী (সা.) প্রথম যার কাছে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করেন তিনি ছিলেন একজন মহিলা। মহানবীর দাওয়াতে সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করে তিনিই প্রথম মুসলমান হওয়ারও গৌরব অর্জন করেছিলেন। এই পূণ্যবতী মহিলা ছিলেন মহানবীর সহধর্মিনী বিবি খাদিজা (রা.)। ইতিহাস থেকে জানতে পারি, ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রথম যিনি শহীদ হন তিনিও ছিলেন একজন মহিলা। ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের গৌরবময় ভূমিকার হাজারো কাহিনী ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়। হাজারো সমস্যা আর বিপদ মুসিবত কাঁধে নিয়েও তারা অটল পাহাড়ের মত ইসলামের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিলেন। ভয়-ভীতি, প্রলোভন কোন কিছুই তাদেরকে দ্বীনের পথ থেকে সরাতে পারেনি। হযরত ওমরের (রা.) ইসলাম গ্রহণের কাহিনী সকলেরই জানা। শত নির্যাতনের পরও তার বোন যখন ইসলাম ছাড়তে রাজী হলোনা তখন সিংহহৃদয় ওমরের বুকই কেঁপে উঠলো। কোন সে শক্তির বলে অবলা নারী এমন দুঃসাহসী হলো সে সন্ধান নিতে গিয়ে নিজেই এবার আশ্রয় নিল ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে। এভাবেই ওমরের (রা.) মত একজন বীর একজন নারীর দ্বারা ইসলামের পথে এলেন।

ইসলাম নারীকে যে মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছে তাও তুলনাবিহীন। সে সমাজে নারীদের কোন সামাজিক মর্যাদা ছিলনা। শিশু কন্যাদের জীবন্ত কবর দেয়া হতো। নারীরা ছিল সম্পত্তির মত। সম্পদ ভাগের সময় তাদেরকেও ভাগ করে দেয়া হতো। অথচ ইসলাম এসে তাদেরকেই উল্টো সম্পদের ভাগ দেয়ার নির্দেশ দিল। মায়ের পায়ের তলে বেহেশতের ঘোষণা দিয়ে তাদের সামাজিক মর্যাদাকে তুলে ধরল সুউচ্চে। নারী সমাজ দীর্ঘদিনের বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পেল।

www.pathagar.com

জ্ঞান-বিজ্ঞানেও তারা বিশেষ অবদান রাখেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) ছিলেন প্রসিদ্ধ হাদীস সংগ্রহকারী। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ মহিলা কবিদের একজন, যার কবিতা রাসূল (সা.) খুব পছন্দ করতেন। সে সময় মহিলা সাহাবীগণ প্রায় প্রতিটি জিহাদে শরীক হতেন। তাদের সাহস, বীরত্ব, ত্যাগ ও কোরবানীর অনেক চমকপ্রদ কাহিনী জানা যায় তাদের জীবনী পড়লে। সে সব আদর্শ নারীদের জীবনী পড়ে তাদের মত জীবন গড়ার চেষ্টা করা উচিত আমাদের মা-বোনদের।

ষোল ● একতায় বল

'একতায় বল' একথা কার না জানা? কথায় বলে, দশের লাঠি একের বোঝা। বড় কোন কাজ করতে হলে তাই আমাদেরকে দলবদ্ধ হতে হবে। বিশেষ করে যে সমাজে আল্লাহর আইন পুরোপুরি কায়েম নেই সেখানে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অবশ্যই আমাদের সংগঠিত হতে হব। এটা আল্লাহ পাকের কড়া হুকুম। আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে বলেছেন, **তোমরা আল্লাহর রশি শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং দলাদলিতে পড়ে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।** রাসুল (সা.) আরো কড়া কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, **তোমরা (সব সময়) জামায়াত বা দলবদ্ধ হয়ে থাকবে। যে জামায়াত ছেড়ে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেলো, সে যেন ইসলামের হার নিজের গলা থেকে খুলে ফেললো।**

অতএব দ্বীন কায়েমের জন্য আজকে আমাদের সকলের সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের লক্ষ্যে নারী-পুরুষ, ছাত্র-ছাত্রী, ধনী-গরীব সকলের সম্মিলিত হওয়া এবং ঐক্যবদ্ধভাবে এ পথে এগিয়ে চলা।

www.pathagar.com

সতের ● ছাত্র-ছাত্রী ভাই-বোনদের জন্য সংগঠন

বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ ও ছাত্রী সমাজকে আল্লাহর কোরআন ও রাসুলের সুন্নাহ অনুযায়ী গড়ে তোলার মহৎ সংকল্প নিয়ে গঠিত হয়েছে আলাদা আলাদা সংগঠন। এ আলাদা সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্য হলো যাতে করে পর্দাপ্রথা রক্ষা করে ছাত্র ছাত্রী সবাই দ্বীনের আন্দোলনে শরীক হতে পারে।

আমাদের জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহ যে বিধান দিয়েছেন আমরা যেন সবাই সেভাবে গড়ে উঠতে পারি, আমাদের প্রিয় নবী আমাদের চলার যে পথ দেখিয়ে গেছেন আমরা যেন সে পথে চলতে পারি, সে জন্য চাই পরস্পরের মধ্যে গভীর সম্পর্ক ও সহযোগিতা। এর মধ্যেই রয়েছে আমাদের সকলের কল্যাণ। এ কল্যাণের পথে বাংলাদেশের ছাত্র ও ছাত্রী সমাজকে ডাকা এবং সেই পথ ধরে এগিয়ে চলার জন্যই গড়ে তোলা হয়েছে এসব সংগঠন। বাংলাদেশের ইসলাম প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের মনে এসব সংগঠন জ্বেলেছে আশার আলো। শতাব্দীর ঘুম ভাঙিয়ে তাদের প্রাণে এনেছে নতুন জোয়ার। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর পথে চলতে চায় এসব সংগঠন তাদের জন্য বাড়িয়ে দিয়েছে সাহায্যের হাত। একবিংশ শতাব্দীকে ইসলামের বিজয়ের শতাব্দীতে পরিণত করার জন্য তারা চালিয়ে যাচ্ছে নিরলস প্রচেষ্টা। যে সব ছাত্র ছাত্রী নিজেদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে চায়, যারা নিজেদের জন্য, সমাজ ও সভ্যতার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ চায় তারা দলে দলে শামিল হচ্ছে এসব সংগঠনে। যারা আল্লাহকে ভালবাসে, আল্লাহর নবীকে ভালবাসে তারা এসব সংগঠনে জড়িত হয়ে ভাই-বোন, পাড়াপড়শী, আত্মীয়স্বজন ও যেখানেই মানুষের সাথে মিলিত হতে পারছে সেখানেই মানুষকে ডাকছে আল্লাহর দ্বীনের পথে।

এভাবে গড়ে উঠতে পারলেই আদর্শ মুসলিম হিসেবে আমরা গড়ে

www.pathagar.com

উঠতে পারবো। আদর্শ মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠা ছাড়া সমাজে মর্যাদা ও সম্মানের সাথে বাঁচা খুবই দুরূহ। আর আমরা যদি আল্লাহর কোরআন ও রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী আমাদের জীবনকে গড়ে তুলতে পারি তবে এ দুনিয়ায় যেমন আমরা শান্তি পাবো তেমনি আখেরাতে পাবো মুক্তি। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের এটাই একমাত্র পথ। আর আমাদেরও চূড়ান্ত উদ্দেশ্য আল্লাহকে খুশি করা, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা। এ জন্য এসব সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছেঃ

১. বাংলাদেশের ছাত্র সমাজকে আল্লাহর কোরআন ও রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী গঠন করা।
২. আদর্শ মুসলিম হিসাবে তাদের গড়ে তোলা।
৩. আল্লাহর দ্বীনকে আল্লাহর এ দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা।
৪. আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার এ চেষ্টা ও সাধনার মধ্য দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।
৫. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি ও মুক্তি লাভ করা।

এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের জন্য তারা যে কাজগুলো করছে তা হলোঃ

১. বিভিন্ন ভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ইসলামের সঠিক ধারনার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার।

২. যেসব ছাত্র-ছাত্রী ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করতে ইচ্ছুক তাদেরকে সংগঠনের পতাকাতলে সমবেত ও সংগঠিত করা। আর যারা সংগঠনে শামিল হলো তাদেরকে ইসলাম অনুযায়ী জীবন যাপনের উপযোগী উন্নত নৈতিক জীবন যাপনের ট্রেনিং দেয়া।

৩. ছাত্র সমাজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদের বিভিন্নমুখী সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

www.pathagar.com

যারা আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার এ সংগ্রামে যথেষ্ট তৎপর নয় তাদেরকে ধমক দিয়ে আল্লাহ বলেছেন, **হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হয়েছে? কেন তোমরা সংগ্রাম করছো না ঐ সমস্ত অসহায় নারী, বৃদ্ধ ও শিশুদের খাতিরে– যারা দুর্বল হওয়ার কারণে নির্যাতিত হচ্ছে আর ফরিয়াদ করে বলছে– হে আল্লাহ, এই জালিম জনপদ থেকে তুমি আমাদেরকে বাঁচাও, আমাদের জন্য তোমার তরফ থেকে সাহায্যকারী পাঠাও।**

আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান রাখবো আর ঈমানদারদেরকে দেয়া আল্লাহর এ কঠোর নির্দেশ দেয়ার পরও চুপচাপ বসে থাকবো, তাও কি হয়? আল্লাহ যে ঈমানদারদের ডাক দিয়েছেন সে ঈমানদার তো আমরাই। আমাদেরকেই তো তিনি ডেকে বলেছেন দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য। যে সাহায্যকারীর জন্য চিৎকার করছে আজকের বিশ্বমানবতা, সে সাহায্যকারী তো আমাদেরই হতে বলেছেন আল্লাহ। আর আমাদের নবী বলেছেন, **পড়শীকে অভুক্ত রেখে যে পেট পুরে খায় সে নয় আমার দলের কেউ**। ফলে নবীর দলে থাকতে হলে, নিজের ঈমান ও মুসলমানিত্ব বাঁচাতে হলে এইসব অসহায় নিরন্ন মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য দ্বীনকে অবশ্যই বিজয়ী করতে হবে আমাদের। নামাজ পড়া যেমন ফরজ, মানুষের কষ্ট দূর করার জন্য আন্দোলন ও সংগ্রাম করাও তেমনি ফরজ। আল্লাহ খলিফা হিসাবে পৃথিবীকে সুন্দর করার জন্য তাই আমাদের রয়েছে অপরিসীম দায়িত্ব।

এসো ভাই, এসো বোন, এসো বন্ধুরা– সংগঠনের পতাকাতলে সমবেত হয়ে মানবতার মুক্তির জন্য, নিজেদের কল্যাণের জন্য, সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার সংগ্রামে আজ ঝাপিয়ে পড়ি। শপথ করি, দ্বীনকে বিজয়ী না করে আমরা বিশ্রাম নেবো না।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এটা আল্লাহরই কথা। সুতরাং তাবলীগ জামায়াতের কর্মকাণ্ড মানুষের ক্ষতিরই কারণ। এটা না বুঝে ঔষধ মনে করে বিষ খাওয়ার মতোই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। অতএব এটাকে তো অবহেলা করতেই হবে এবং এর ক্ষতির দিকগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে।

কেন এই গযব?

এবার (২০০৪ সাল) নিয়ে দু'বার (২০০১ ও ২০০৪ সাল) তাবলীগ জামায়াতের জোড় (মুরব্বীদের বিশেষ সমাবেশ)-এর সময় ঘূর্ণীঝড় হয়। এতে অনেক মুসল্লী মৃত্যুবরণ করেন এবং অনেকেই আঘাত প্রাপ্ত হন। আমরা জানি দ্বীন ইসলাম প্রচারের কাজ যারা করেন তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুদরতী শক্তির মাধ্যমে সাহায্য করেন। কিন্তু তাবলীগ জামায়াত দাওয়াতে দ্বীনের কাজ করলেও তাদের উপর আল্লাহর সাহায্য না এসে এ গযব কেন? এ প্রশ্ন এখন বিবেকবান মানুষের মনকে নাড়া দিচ্ছে। তাই এর কারণ তালাশ করা জরুরি হয়ে পড়েছে। কিন্তু এর উত্তর কোথায় পাব। আমার বিবেক বলছে ইতিহাসই এর বড় সাক্ষী। সুতরাং আমাদেরকে অতীত ইতিহাস তালাশ করে দেখতে হবে, দ্বীন প্রচারকগণের বেলায় অতীতে এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটেছে কিনা। দেখতে হবে নবী-রাসূলগণ দ্বীন ইসলাম প্রচারের সময় আল্লাহর গযবের সম্মুখীন হয়েছেন কিনা। অতঃপর হয়ে থাকলে কেন?

ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অনেক নবী-রাসূল এবং সাহাবায়ে কেরামগণ দ্বীন ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে আযাব-গযবের সম্মুখীন হয়েছেন। তন্মধ্যে ইউনুছ (আঃ) চল্লিশ দিন পর্যন্ত মাছের পেটে ছিলেন। তিনি আল্লাহর হুকুম ছাড়াই হিজরত করতে গিয়ে আল্লাহর গযবের সম্মুখীন হন। ওহুদের যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামগণ নবীজীর (সা.) নির্দেশ লঙ্ঘন করে সামান্য গনিমতের মালের লোভে পাহাড়ের পাদদেশের পাহারার দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ায় কাফেররা সে দিক থেকে এসে অর্তকিত হামলা করে অনেক সাহাবাকে শহীদ করে দেন। সেদিন সামান্য ভুলের জন্য অনেককে প্রাণ দিতে হয়ে ছিল। এ দু'টি ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রথম ঘটনায় ইউনুছ (আঃ) কাফেরদের অত্যাচারে হিজরত করতে আল্লাহর হুকুম নেননি। দ্বিতীয় ঘটনায় সাহাবায়ে কেরামগণ নবীজীর (সা.) নির্দেশ ছাড়াই পাহাড়ের পাদদেশের পাহারার কাজ ছেড়ে চলে আসেন। এর ফলে উভয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহর পক্ষ থেকে গযব নেমে আসে। এ গযব তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য নয়। বরং আল্লাহর মিশন বাস্তবায়ন করার জন্য অনুকুল পথের শিক্ষা দেয়া। তাই এ দু'টি ঘটনার থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি যে, দ্বীনে হকের দাওয়াত দিতে গিয়ে সকল অবস্থায় আল্লাহর এবং নবীর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে, এর বিপরীত পথ অবলম্বন করলেই আল্লাহর গযব আসা স্বাভাবিক। অতঃপর এ দু'টি ঘটনার আলোকে তাবলীগ জামায়াতের জোড় (মুরব্বীদের সমাবেশ)-এর সময় ঘূর্ণীঝড়ে

www.pathagar.com

আক্রান্ত হওয়াকে আল্লাহর গযব হিসেবেই ধরে নেয়া যায়। তারা দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অনুসরণ করছেন সেটি আল্লাহ ও রাসূলের দাওয়াতের পদ্ধতি নয়। তাদের নিয়ত সহী হলেও দাওয়াত ও তাবলীগের পদ্ধতি সহী নয়। তাবলীগ জামায়াতের মুরব্বীগণ এ দুর্যোগকে কিভাবে মূল্যায়ন করছেন জানি না। তবে আমার দৃষ্টিতে এটি একটি গযব। তাই তাদের দাওয়াত ও তাবলীগের বর্তমান কর্মপদ্ধতি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এর পরিবর্তন, পরিবর্ধন নিজেদের মনগড়া করলে চলবে না। সেটা হতে হবে নবী-রাসূলগণের দাওয়াত ও তাবলীগের কর্মপদ্ধতির ন্যায়। অর্থাৎ আমাদের দাওয়াত ও তাবলীগের পদ্ধতি বার বার তলিয়ে দেখতে হবে সেটাতে আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ আছে কি না। আমরা যতক্ষণ হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকব ততদিন দ্বীনের কাজ করতে গিয়ে আল্লাহর গযব থেকে রেহাই পাব। পাশাপাশি আল্লাহর গায়েবী সাহায্যওপাব। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, যে কাজে লাভ বেশি সে কাজের নিয়ত ও কর্মপদ্ধতি ভুল হলে ক্ষতিও বেশি হবে।

মূলত যারা দ্বীনের কিছু অংশ ছাড়ে এবং কিছু অংশ গ্রহণ করে, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতে লাঞ্ছিত করে থাকেন। তাবলীগ জামায়াত তাগুতের ভয়ে দ্বীনের কিছু অংশ ছেড়েছে এবং কিছু অংশ আমল করছে আর দ্বীনের নামে নতুন কিছু গ্রহণ করছে। কোন কাজ তারা ছেড়েছেন এবং দ্বীনের নামে কোন কাজ তারা সংযোজন করেছেন তা অন্য অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে বলতে চাই তাবলীগ জামায়াত দ্বীনের কিছু অংশ ছেড়েছে এবং দ্বীনের নামে নতুন কিছু সংযোজন করেছে বিধায় সম্ভবত এ গযব। এ থেকে এখনি শিক্ষা নেয়া জরুরি। এটাই আমাদের বিশ্লেষণ। কিন্তু আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত। তিনিই ভাল জানেন।

আল্লাহ বলেন- 'তবে কি তোমারা কিতাবের কিছু অংশের উপর ঈমান রাখ, আর কিছু অংশের উপর ঈমান রাখ না? অতএব কি শাস্তি হতে পারে তার, যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য হতে এ রূপ করে, পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ব্যতীত? আর কিয়ামত দিবসে নিক্ষেপ করা হবে তাকে বড় কঠিন আযাবের মধ্যে। আর আল্লাহ তায়ালা বেখবর নহেন তোমাদের কার্যকলাপ হতে।' (সূরা বাকারাহ-৮৫)

সমাপ্ত

www.pathagar.com

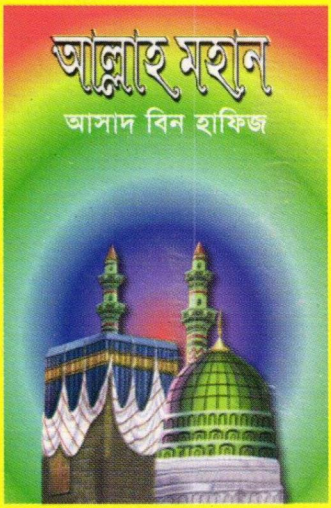

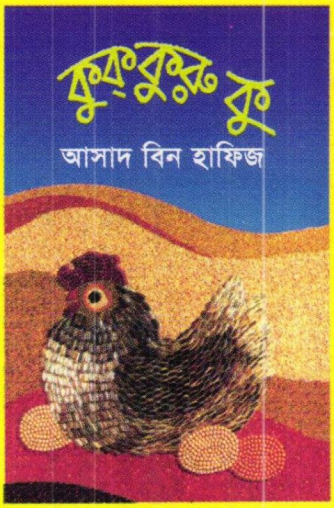

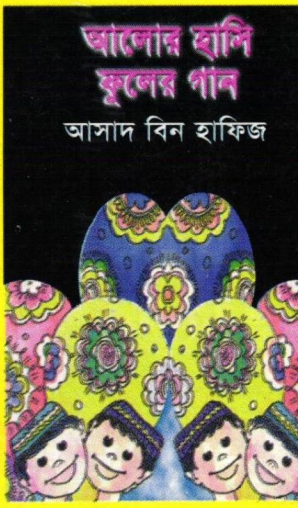

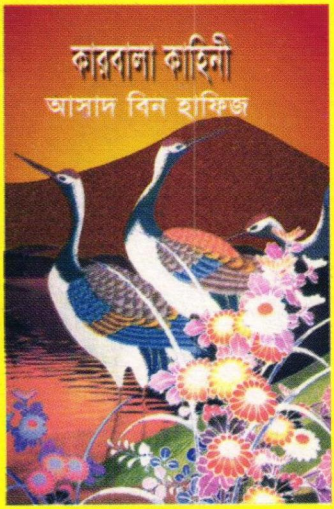

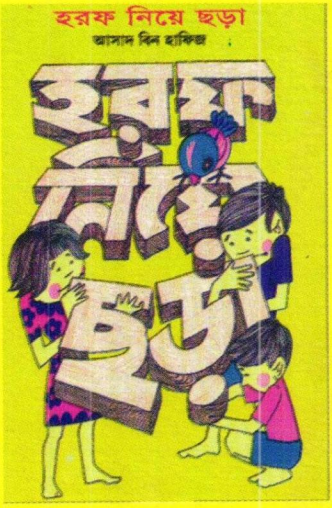

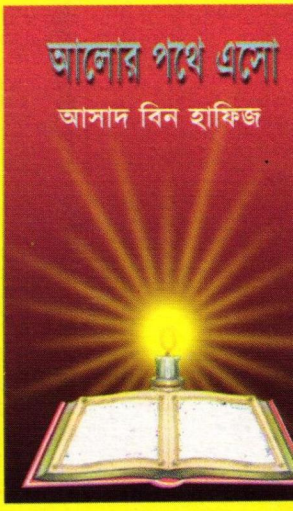

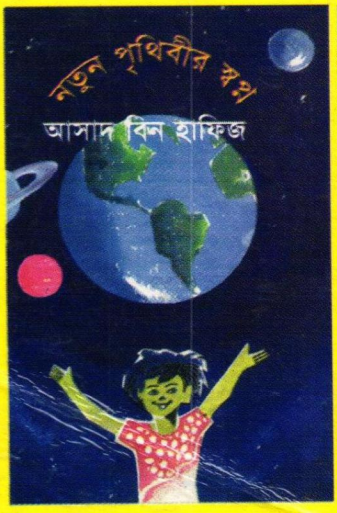

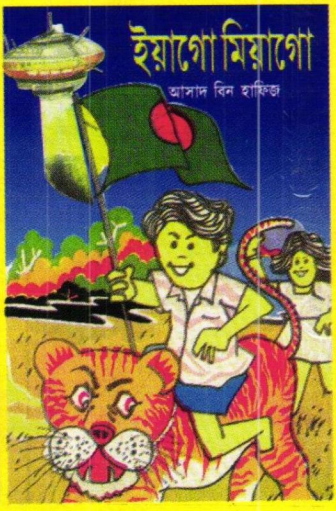

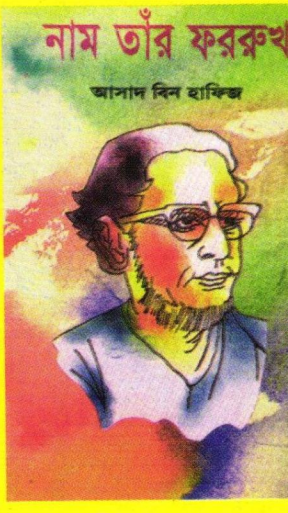

ঘুঘু প্রকাশন

আলোর পথে এসো ॥ আসাদ বিন হাফিজ, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ১৯৯৯
প্রীতি প্রকাশন, ৪৩৫/ক বড়মগবাজার, ফোন: ৮৩২১৭৫৮, ৮৩১৯৫৪০
ISBN 984-581-154-1 ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৩১৯৫৪০ PRICE TK. 20.00